যাকাতের ব্যবহারিক বিধান

যাকাতের
ব্যবহারিক
বিধান

এ. জি. এম. বদরুদ্দুজা

যাকাতের ব্যবহারিক বিধান

এ. জি. এম বদরুদ্দোজা

আধুনিক প্রকাশনী

প্রকাশনায়ঃ
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

আঃ প্রঃ ১৪১

প্রথম প্রকাশঃ
জমাদিউল আউয়াল ১৪১০
অগ্রহায়ণ ১৩৯৬
ডিসেম্বর ১৯৮৯

বিনিময়ঃ ৬০০ টাকা

মুদ্রণে
কোহিনুর প্রেস
ঢাকা–১১০০

JAKATER BABOHARIK BHIDHAN by A.G.M. Bodoroddoza Published by Adhunik Prokashani
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price: Taka 6'00 only

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান
ও
শ্রদ্ধেয় আব্বাজান—এর
দস্ত মোবারকে

মাওলানা আবু যাকের মুহাম্মাদ বদরুদ্দোজার লিখিত "যাকাতের-ব্যবহারিক বিধান" নামক বইটির পান্ডুলিপি গত রমযান মাসে সবটুকুই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। দ্বীনদার আধুনিক শিক্ষিত এমনকি স্বল্প শিক্ষিত লোকদের জন্য খুবই উপযোগী মনে করে আমি বইটি অবিলম্বে প্রকাশ করার জন্য লেখককে তাকিদ দেই।

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। যাকাত সবার উপর ফরয নয় বলে নামায রোযার মতো সর্ব সাধারণের মধ্যে এর মাসলা মাসায়েল নিয়ে ব্যাপক চর্চা হয় না। যারা যাকাত দেন তারা ওলামায়ে কেরাম থেকেই মাসলা জেনে নেন।

নামায রোযার মাসলা-মাসায়েল জানার জন্য বাজারে বহু বই পাওয়া যায় বলে সবার পক্ষেই জানা সহজ। কিন্তু যাকাত সম্পর্কে সর্বসাধারনের উপযোগী আলাদা বই তেমন নেই। এর জন্য ফেকাহর কিতাবের বাংলা অনুবাদ তালাশ করতে হয়। এ জাতীয় কিতাবে যাকাত ছাড়াও অনেক বিষয়ের মাসলা আলোচনা করা হয় বলে তা বিরাট আকারে অথবা একাধিক খন্ডে প্রকাশিত হয়। ফলে নামায বা রোযার জন্য যেমন আলাদা বই পাওয়া যায় যাকাতের জন্য তেমন চটি বই পাওয়া যায় না।

মাওলানা বদরুদ্দোজার এ বইটি এ বিরাট অভাব পূরণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। বইটির পান্ডুলিপি পড়ে আমার এ ধারণাই হয়েছে যে, যাকাত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল দিকের আলোচনাই সহজভাবে বুঝাবার ব্যবস্থা এ বইটিতে করা হয়েছে। অল্প শিক্ষিত লোকের পক্ষেও যাকাতের মাসলা মাসায়েল জানার সুযোগ হওয়ায় এ বইটি যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এ বইটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে। যাকাতের টাকা যে আটটি খাতে খরচ করার জন্য কুরআন পাকে

নির্দেশ রয়েছে এর মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদও একটি খাত। তাই ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে যাকাত দেবার গুরুত্ব জনগণকে বুঝাবার সময় বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দিতে হয়। এ বইটি কর্মীদের এ বিরাট দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

আমি আন্তরিকভাবে এ বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। দোয়া করি যেন দ্বীনের খেদমতের জন্য আল্লাহ পাক এ বইটিকে কবুল করেন। আমীন।

অধ্যাপক গোলাম আযম

ভূমিকা

যে পাঁচটি ভিত্তির উপর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত তার একটি হচ্ছে "যাকাত"। গুরুত্বের দিক থেকে নামাযের পর পরই যাকাতের স্থান। কুরআন মজিদে অসংখ্যবার নামায কায়েমের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের সমাজের অবস্থা দেখলে মনে হয় না যে, আমরা আল্লাহর নির্দেশের তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি। সম্ভবতঃ ১০% গুরুত্বও আমাদের নিকট নেই।

বিগত ৩/৪ বছর হতে যাকাত ও ওশরের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে সমাজের বিভিন্ন ধরনের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে দেখা গেলো যে, যাকাতের ব্যাপারে তাঁদের পরিপূর্ণ ধারণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অনেক শুভাকাংখী আন্তরিকাতার সাথে প্রস্তাবও দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত হলেও এ বিষয়ের ওপর প্রাথমিক ধারণা পাওয়ার উপযোগী বইয়ের অভাব আপনাদের পূরণ করতে হবে। দুঃখের বিষয় ইচ্ছা থাকার পরও এতদিন বিষয়টি উপস্থাপন করার সময় হাতে মিলেনি।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর কুরআন হদীস ও অন্যান্য ফিকাহ শাস্ত্র হতে সংক্ষিপ্তভাবে "যাকাতের ব্যবহারিক বিধান" শিরোনামে বইটি লিখায় হাত দিয়েছি। এতে বিভিন্ন ধরনের ক্রটি-বিচ্যুতি অথবা অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদের পক্ষ থেকে সংশোধনের ব্যাপারে সহযোগিতা পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

পরিশেষে এ সামান্য লিখনী হতে যদি মুসলিম মিল্লাতের সামান্যতম উপকারও হয় তবে মনে করবো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ অধমের পরিশ্রম টুকু কবুল করেছেন।

নিবেদক-
এ, জি, এম. বদরুদ্দুজা
২১ শে রমজান/১৪০৯

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

যাকাত ফরয ও আরকানে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ৯
যাকাত পূর্বেও ফরয ছিল ১০
যাকাতের অর্থ ১২
যাকাত কখন ফরয হয় ১২
যাকাত না দেয়ার পরিণাম ১২
যাকাত অস্বীকারকারীর প্রতি শরীয়াতের-বিধান ১৪
”যাকাত” ও “করের” মধ্যে পার্থক্য ১৫
যাকাতের নিসাব ১৭
যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয ১৮
যে ব্যক্তি ও মালে যাকাত ফরয নয় ১৮
যে সকল মালের যাকাত ফরয ১৮
বিভিন্ন মালের যাকাতের হার ১৯
স্বর্ন, রৌপ্য ও প্রচলিত মুদ্রা ১৯
ব্যবসায়ের মাল ২১
গৃহপালিত পশুর যাকাত ২২
শিল্প কারখানার ও যন্ত্রপাতির যাকাত ২৪
খনিজ সম্পদ ২৬
কৃষিজাত দ্রব্যের যাকাত ২৭
ওশরের নিসাব ৩০
ওশরী ও খারাজী জমি ৩০
বাংলাদেশের জমি ওশরী কিনা? ৩২
যাকাত ও ওশরের পার্থক্য ৩৩
যাকাত ব্যয়ের খাত ৩৪
কাকে এবং কোন খাতে যাকাত দেয়া যাবে না। ৩৭
যাকাত আদায়ের পদ্ধতি ৩৮
সামষ্টিকভাবে যাকাত আদায়ের সুফল ৪২
ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ে যাকাতের ভূমিকা ৪৪
যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্য ৪৬
যাকাত আদায়ের মৌসুম ৪৮
পরিশিষ্ট ৫১

بسم الله الرحمن الرحيم

এক ঃ যাকাত ফরয ও আরকানে ইসলামের অর্ন্তভুক্ত

পবিত্র কুরআনে বহু জায়গায় নামাযের সাথে সাথে (২৬ বার) যাকাত আদায় করারও নির্দেশ রয়েছে। সুরায়ে বাকারার ১১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে—

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾ البقرة

"তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো, আর নিজেদের জন্য কল্যান কর যা কিছু আগেভাগে পাঠাবে (করবে) তা আল্লার নিকট পাবে, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকল কাজ কর্ম দেখছেন।"

সুরায়ে তওবার ১০৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا التوبة

"আপনি তাদের মাল হতে যাকাত আদায় করুন, যা দ্বারা তাদেরকে পাক ও পবিত্র করবেন।"

সুরায়ে আনআমের ১৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ الانعام

"এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং অধিকার আদায় কর— এগুলো কর্তনের সময়ে।"

হাদীসে রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে যাকাত আরকানে ইসলামের ৩য় রুকন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ لِشَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ
اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ
وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ - بخارى

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ (১) এ সাক্ষ্য দেয়া- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ পালন করা (৫) রামজানের রোজা রাখা (বুখারী শরীফ)।

উল্লেখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসে রাসূলের বর্ণনার আলোকে যাকাতের ফরযিয়াত ও যাকাত যে আরকানে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন তা আমাদের সামনে সুস্পস্টভাবে ফুটে উঠেছে।

দুইঃ যাকাত পূর্বেও ফরয ছিলো

নামায ও রোযা যেমনিভাবে সকল নবীর উম্মাতের ওপর ফরজ তেমনিভাবে যাকাতও ফরয ছিলো। সূরায়ে বাকারার ৮৩ নম্বর আয়াতে বনী ইসরাইলদের অংগীকার গ্রহণ প্রসংগে আল্লাহ বলেনঃ

لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ بنی اسرآئیل

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না এবং মাতাপিতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতীম ও মিছকীনদের প্রতি ইহছান বা ভালো আচরণ করবে এবং লোকজনকে ভালো বা কল্যাণ জনক উপদেশ দেবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে।"

হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর বংশধর নবীদের বিভিন্ন কাজের নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ বলেনঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ

وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ الانبياء

"আমরা তাদের ইমাম বানিয়ে ছিলাম, তারা আমার নির্দেশানুযায়ী হেদায়াত দান করেছিলো, আর উহার মাধ্যমে আমি তাদের ভালো ও নেক কাজের আদেশ, সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলাম। (সুরা আম্বীয়া)

হযরত ইসা (আঃ)– এর একটি ভাষণ সম্পর্কে কুরআন পাকে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন বেঁচে থাকি যেন সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করি"–

এমনিভাবে আরো বহু আয়াতে পূর্বেও যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি কুরআনে পাকে উল্লেখিত আছে।

তিনঃ যাকাতের অর্থ

যাকাত (زَكَوا ۴) শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি ও পরিশুদ্ধি। কেননা যাকাত দানে সম্পদশালীর সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তার অন্তর কৃপণতার কলুষ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় মুসলমানদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (বছরের হিসেব শেষে উদ্বৃত্ত সম্পদের ২$\frac{১}{২}$ % বা (শতকরা আড়াই ভাগ) আল্লাহর নির্ধারিত খাতে সম্পূর্ণভাবে দান করাকে যাকাত বলে। এতে ব্যক্তির নিজের কোন লাভ ও সুনাম বা প্রদর্শনেচ্ছা থাকতে পারবেনা।

চারঃ যাকাত কখন ফরয হয়

যাকাত প্রথমত মক্কাতেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তখন কোন মালের যাকাত দিতে হবে এবং যাকাতের নিসাব বিস্তারিত বিবরণ নাযিল হয়নি। যার ফলে সাহাবা (রাঃ)–গণ প্রয়োজন অতিরিক্ত সকল মাল দান করে দিতেন। (তাফসীরে মাজহারী)। অতপর দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় যাকাতের পূর্ণাংগ বিবরণ নাযিল হয়। এ কারণেই বলা হয় মদীনাতেই যাকাত ফরয হয়েছে।

পাঁচঃ যাকাত না দেয়ার পরিণাম

যেহেতু সালাতের ন্যায় যাকাতও ইসলামের একটি মৌলিক ভিত্তি ও ফরয, সেহেতু যাকাত আদায় না করা শরয়ী দৃষ্টিতে কত মারাত্মক অপরাধ ও ঈমান বিরোধী কাজ তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া কুরআন মজীদে এর পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو
بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ ۝ التوبة

"যারা সোনা রূপা সঞ্চয় করে অথচ আল্লাহর নির্ধারিত পথে ব্যয় করে না (এখানে যাকাত অর্থে) তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন, যে দিন সে সম্পদকে দোজখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে পরে তাদের কপাল, পাঁজর এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে (আর বলা হবে) স্বাদ গ্রহণ করো দুনিয়াতে যা জমা করে ছিলে"। —তাওবাঃ–৩৪–৩৫)

কুরআন মজীদের আরো অন্যান্য আয়াতে যাকাত আদায় না করার অশুভ পরিণতির উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসে রাসূল (সাঃ)–এর মধ্যেও যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ রয়েছে।

নিম্নের হাদীসটি (অনুবাদ) উল্লেখ্যঃ– হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে ধন–সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন–সম্পদকে তার জন্য একটি ভয়ংকর বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে। যার চোখ দুটোর ওপর দুটো কালো বিন্দু থাকবে, সাপটি এ ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে তার দু' গালে কামড়াতে কামড়াতে বলতে থাকবে আমি তোমার ধন–সম্পদ—আমি তোমার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার।(বুখারী)।

যাকাত আদায় না করে কৃপণতা প্রদর্শন সংক্রান্ত শাস্তির উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۔ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۔ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔ (ال عمران)

“আল্লাহ যাদেরকে আপন ফজল হতে (সম্পদ) কিছু দান করেছেন, যা নিয়ে তারা কৃপণতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে, ইহা তাদের জন্যে কল্যাণকর। বরং ইহা তাদের জন্যে অকল্যাণ বা ক্ষতিকর। যে সম্পদ নিয়ে তারা কৃপণতা করছে কিয়ামতের দিন উহা শিকলরূপে তাদের ঘাড়ে পরিয়ে দেয়া হবে।” —আলে-ইমরানঃ১৮০

ছয়ঃ যাকাত অস্বীকারকারীর প্রতি শরীয়াতের বিধান

যাকাত যে ফরয তা কুরআন মজীদ ও হাদীসে রাসূলের মাধ্যমে আমরা ইতিপূর্বে জানতে পেরেছি। অতএব ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে ফরযকে অস্বীকারকারী হল কাফের বা মুরতাদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা যাকাত আদায় না করাকে মুশরিকদের কাজ বলেছেন।

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ (حٰمٓ السجدة)

“ধ্বংস অনিবার্য, ঐ সকল মুশরিকদের জন্যে যারা যাকাত আদায় করে না।” —হামীম-আস্সাজদা

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন ঘোষণা করেছিলেন (তাঁর খিলাফত আমলে) " আল্লাহর কসম যারা রাসূলের জীবদ্দশায় যাকাত দিতো, তারা যদি আজ ছাগলের একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে তবে আমি

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।" তখন হযরত ওমর (রাঃ) সহ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রশ্ন করেন, যারা তাওহীদ, রিসালাতে বিশ্বাসী, নামাযও আদায় করে, শুধু মাত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করাতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হবে কেন? অবশেষে হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর যুক্তি ও দৃঢ়তার কারণে সাহাবায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধভাবে এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়ে "ইয়ামামার" যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।

অতএব ইসলামের অন্যান্য বিধান মানার পরও যদি শুধু যাকাত দিতে অস্বীকার করে বা যাকাত আদায় না করে মুলত তারা ইসলামকেই অস্বীকার করলো।

সাতঃ 'যাকাত' ও 'করের' মধ্যে পার্থক্য

যাকাত আদায় করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠে যে, আমরা তো রাষ্ট্রীয়ভাবে 'কর' বা খাজনা দিয়ে থাকি, তাহলে যাকাত দিতে হবে কেন? অথবা আদায়কৃত করের অংশ যাকাতের অংশ থেকে পরিশোধ হবে কিনা? ইত্যাদি। আমাদের ভালোভাবে জেনে নিতে হবে 'যাকাত' 'কর' নয়, মূলত ইহা অর্থনৈতিক ইবাদাত। কর বা ট্যাক্স ও ইবাদাতের মধ্যে মৌলিক ধারণা ও নৈতিক মর্যাদার দিক দিয়ে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং যাকাতকে যেন কখনো 'কর' বা ট্যাক্স রূপে মনে করা না হয়, সেদিকে সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নিম্নে যাকাত ও করের মৌলিক পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

(১) যাকাত শুধু মুসলমানদের ওপর ফরয ইবাদাত ও ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। তাই নিজের সঞ্চিত সম্পদের হিসেব নিজেই করবে

এবং তার যথার্থ যাকাত আদায় করবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকার এর ব্যবস্থা করুক, আর নাই করুক।

করের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা হয়ে থাকে এবং ইহা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যাপারও নয়। কর মুসলিম অমুসলিম সকল নাগরিককেই আদায় করতে হয়।

(২) কর বা ট্যাক্সের টাকা দ্বারা নাগরিক হিসেবে সকলেই সুবিধে ভোগ করে। যেমন– দেশ রক্ষা, রাস্তা–ঘাট ও সেতু নির্মাণ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যাকাত আদায়ে কোন স্বার্থ জড়িত থাকতে পারবে না, বরং শুধু যাকাত গ্রহীতাই এর সুবিধে ভোগ করবে।

(৩) যাকাত ধার্য করা হয় মূল অস্থাবর সম্পদের উপর। এতে আয় ও মূলধনের কোন পার্থক্য করা হয় না। বরং মাল ঘরে জমা থাকলেও যাকাত দিতে হয়। পক্ষান্তরে কর ধার্য করা হয় আয়ের উপর, আয় বৃদ্ধি হলে করও বৃদ্ধি পায়।

(৪) যাকাতের মধ্যে করের সকল উত্তম গুণাবলী বিদ্যমান থাকার পরও যাকাতের হার অপরিবর্তনীয়। চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যে হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা আজ পর্যন্ত কোন স্বেচ্ছাচারী সরকারও পরিবর্তনের সাহস করেনি। এ কারণেই সরকারকে মিতব্যয়ী হতে হয় ও জনসাধারণ আর্থিক যুলুম হতে রক্ষা পায়। পক্ষান্তরে করের হার পরিবর্তনের ক্ষমতা সরকারের হাতে কুক্ষিগত। এ ক্ষমতা সরকারকে সেচ্ছাচারী করে তোলে এবং জনগণের ওপর অর্থনৈতিক অন্যায় অত্যাচার চালাতে সহায়তা করে।

(৫) উৎপাদনশীল জমির (স্থাবর সম্পত্তি) ট্যাক্স বা কর বাধ্যতামূলক, দিতেই হবে। (ফসল হোক বা না–ই হোক) অথবা উৎপাদিত ফসলের যাকাত শুধু ফসল উৎপন্ন হলেই দিতে হবে।

এক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক পরিবেশে ($\frac{১}{১০}$ অংশ) ও সেচ ব্যবস্থায় ($\frac{১}{২০}$ অংশ) উৎপাদিত ফসলে যাকাতের হার অভিন্ন নয়।

এখানে ফসলের যাকাতকে “ওশর” বলা হয়। কর জমির ওপর ধার্য হয়। আর যাকাত ফসলের ওপর ধরা হয়।

আটঃ যাকাতের নিসাব

যে সকল সম্পদের মালিক হলে কোন ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয়, ঐ সকল সম্পদ থাকলে সে ব্যক্তিকে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় (সাহেবে নিসাব) বা যাকাত দাঁতা বা যাকাতের পরিমাণ সম্পদের মালিক বলা হয়। স্থাবর সম্পত্তি, উপার্জনের হাতিয়ার, শিল্প–কারখানার যন্ত্রপাতি এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ও আর্থিক ব্যয় বাদে ৭$\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ন বা ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্য অথবা সম পরিমাণ মূল্যের মাল বা নগদ টাকা হচ্ছে যাকাতের নিসাব। এ পরিমাণ সম্পদ কোন মুসলিম ব্যক্তির নিকট পূর্ণ এক বছর থাকলে সে সব সম্পদের ($\frac{১}{৪০}$) চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দেয়া ফরযে আইন

নিসাবের কম হলে এবং এক বছর পুর্ণ না হলে যাকাত ফরয হবে না।

ক. যে ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরজ

শরীয়াতের অন্যান্য ফরজ- যেমন সালাত, সাউম যে সকল ব্যক্তির ওপর ফরয যাকাতও সে সকল ব্যক্তির ওপর ফরয। যেমন প্রাপ্ত বয়স্ক , সুস্থ্য মস্তিষ্ক, স্বাধীন, মুসলমান ইত্যাদি। যাকতের ব্যাপারে সম্পদের মলিক ও পুর্ন এক বছর তার নিয়ন্ত্রণে থাকা অতিরিক্ত শর্ত।

খ. যে ব্যক্তি ও মালে যাকাত ফরয নয়

ক্রীতদাস, অমুসলিম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয নয়, থাকার ঘর-বাড়ী, ব্যবহারিক কাপড় , ঘরের আসবাবপত্র, সওয়ারী ও প্রয়োজনীয় জন্তু-জানোয়ার, স্থাবর সম্পত্তি (যেমন জমি-জমা), কারখানার যন্ত্রপাতি ও দালান-কোঠা, সেবায় নিযুক্ত দাস দাসী, ব্যবাহারের অস্ত্র-শস্ত্রের ওপর যাকাত ফরয নয়।

গ. যে সকল মালের যাকাত ফরয

—নিম্ন লিখিত অর্থ-সম্পদের নির্ধারিত হারে যাকাত আদায় করতে হবেঃ-

(১) স্বর্ণ রৌপ্য ও দেশের প্রচলিত মূদ্রা বা টাকা।
(২) ব্যবসার মাল,
(৩) গৃহ পালিত পশু,
(৪) খনিজ সম্পদ,
(৫) উৎপন্ন শস্য (ওশর)।

এ সকল মালের প্রত্যেকটির যাকাতের হার ও নিসাব বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে এক্ষেত্রে আমাদের দেশে

প্রচলিত ও অধিক ব্যবহৃত ' বিষয়গুলোর প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। আমাদের দেশে নেই বা প্রয়োজনও তেমন হবে না এমন বিষয়ের বিশ্লেষণ এ পুস্তিকায় নিষ্প্রয়োজন মনে করে বাদ রাখা হয়েছে।

নয়ঃ বিভিন্ন মালের যাকাতের হার

ক. স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রচলিত মুদ্রা

স্বর্ণ বিশ মিছকাল আমাদের দেশের হিসেবে (৭$\frac{১}{২}$) সাড়ে সাত তোলা এবং রূপা দু'শত দিরহাম অর্থাৎ (৫২$\frac{১}{২}$) সাড়ে বাহান্ন তোলা হলে যাকোত দাতা (সাহেব নিসাব) হবে। উল্লেখিত সম্পদের চল্লিশভাগের একভাগ ($\frac{১}{৪০}$) বা শতকরা আড়াই ভাগ (২$\frac{১}{২}$%) যাকাত দিতে হবে। ব্যবহৃত অলংকারও যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে তারও যাকাত দিতে হবে। এক বৎসর পুর্ণ না হলে অথবা নিসাবের কিছু কম হলে যাকাত ফরয হবে না।

প্রচলিত মুদ্রা যেমন টাকা, পয়সা , নোট ইত্যাদি বিনিময়ের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং সোনা-রুপার পরিবর্তে এসব ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই প্রচলিত মুদ্রারও চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে যদি সোনা বা রূপার নেসাবের মুল্যের সমান হয়, (শার্মী কিতাব হতে) (৭$\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ণ বা ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্য বা সমমানের মূল্য) ১৩৮৫ হিজরীতে কায়রোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনের সিদ্ধান্তও ইহাই।

বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে সোনা, রূপার মধ্যে যা দেশে অধিক প্রচলিত তারই হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। (আমাদের দেশের টাকা রূপারই স্থলাভিষিক্ত। তাই রূপার মূল্যেই নিসাবের হিসাব করতে হবে। (সৌদী, কুয়েত, আবুধাবি ইত্যাদি দেশে স্বর্ণ প্রচলিত) যাতে

নিসাব পূর্ন হয় তার সাথে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এক কথায় দরিদ্র লোকদের যেবাবে বেশী উপকার হয় সেভাবেই নির্ধারণ করতে হবে। (দুররে মুখতার কিতাব হতে)।

উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে ১৯৮৯ সনে আমাদের দেশে রূপার তোলা ১৭০।– টাকা হতে ১৮০।–টাকা এ হিসেবে ৫২½ তোলার মূল্য দাঁড়ায় আনুমানিক ৯৫০০।– টাকা, বিগত ৬ মাস ও আগামী ৬ মাসেও প্রায় একই মূল্য থাকবে. অতএব যার হাতে ৯৫০০।–টাকা অতিরিক্ত আছে বা সমমূল্যের সম্পদ আছে তাকে (ছাহেবে নিসাব) যাকাত দাতা হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে ২½ % হিসেবে ৯৫০০ টাকার ২৩৭ [illegible]

অতএব, সোনা–রূপা ও দেশের প্রচলিত মুদ্রার যাকাত নির্ধারণে উল্লেখিত নীতি মালা অনুসরণ করে যথাযথ ভাবে যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য যেহেতু রূপার দামই আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য, সেহেতু কোন বছর রূপার মূল্য কত দাঁড়ায় পূর্বেই তা যাচাই করে সুষ্ঠু হিসেবের মাধ্যমে যাকাত আদায় করতে হবে। হিসেব ব্যতীত আনুমানিক দান করলে ফরয আদায় হবে না বরং সাদকা হিসেবে তা গণ্যহবে।

যদি কারো কাছে সোনা ও রূপা নিসাবের কম পরিমাণ থাকে তাহলে দু'টোর মূল্য একত্র করলে যদি রূপার হিসেবে নিসাবের পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি শুধু সোনা নিসাবের কম পরিমাণ থাকে এবং টাকা পয়সা অন্যান্য সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ থাকে তাহলে সোনার যাকাত দিতে হবে না। অন্য মালের যাকাত দিতে হবে। কারণ এদেশের টাকা রূপারস্থলাভিষিক্ত।

খ. ব্যবসায়ের মাল

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত হিসেবে রূপার মূল্যই প্রযোজ্য হবে। এর সাথে সমর্থন পাওয়া যায় দুররে মুখতার কিতাব, শামী এবং ১৩৮৫ হিজরীতে কায়রোয় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনের মতামত। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহঃ) ও হানাফী ইমামগণও মত প্রকাশ করেছেন যে, যাতে গরীবের বেশী উপকার হয় সে হিসেবেই মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সুতরাং রূপার হিসেবেই যাকাতের নিসাব নির্ধারিত হবে।

ব্যবসায়ের মালের ব্যাপারেও একই রীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত সমুদয় মালের মূল্য যদি ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রূপার সমমূল্যের হয়, তাহলে চল্লিশ ভাগের একভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে। আর যদি সোনা, রূপা ও মাল কোনটাই নিসাব পরিমাণ না থাকে তখন তিনটি মিলিয়ে নিসাব ঠিক করতে হবে। যেমন– এক ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ ৫০০০/–টাকা, রৌপ্য ২০০০/–টাকা সঞ্চিত মাল ৭০০০/–টাকা মূল্যের এবং নগদ টাকা ৩০০০।––আছে তখন তাকে ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রূপার নিসাব (৯৫০০।–টাকা) হারে মোট ১৭০০০।–টাকার (২½ % হারে) যাকাত আদায় করতে হবে। কোন ব্যক্তির নিকট যদি বছরের প্রথম ভাগে নিসাব পুরো থাকে মধ্যখানে নিসাবের কিছু কমে গিয়ে পুনরায় বছরের শেষে নিসাব পুরো হয়ে যায়, তাহলেও তাকে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদী, যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, স্টেশনারী দ্রব্য , দালান কোঠা ইত্যাদি সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে না। বাকী সকল সম্পদ ও নগদ অর্থের হিসেব করে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবসায়িক লেনদেনের পাওনা টাকা অথবা যে কোন ধরনের পওনা টাকা যদি দেনাদার আদায়ের ওয়াদা করে অথবা আদায়ের লিখিত দলিল-প্রমাণ থাকে তবে নিসাব পরিমাণ হলে সেক্ষেত্রেও যাকাত দিতে হবে। অবশ্য ৩ প্রকারের পাওনার মধ্যে মতভেদ থাকলেও ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মতে সকল পাওনাতেই যাকাত আদায় করতে হবে। কোন কারখানা বা কোম্পানীতে দেয়া শেয়ারের যাকাত দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রেও কলকব্জা বা উপকরণের খরচের পরিমাণ বাদ দিয়েই হিসেব করতে হবে।

গ. গৃহপালিত পশুর যাকাত

গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর, এর মধ্যে আমাদের দেশের পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এ চারটিই শুধু উল্লেখযোগ্য। যদিও ভিন্ন ভিন্নভাবে যাকাতের হার রয়েছে, এক্ষেত্রে শুধু উল্লেখিত ৪টি পশুর যাকাতের বিবরণদেয়াহচ্ছে।

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে সায়েমা বা বিচরণশীল ও একবছর স্থায়ী হওয়া শর্ত। যে সকল পশু চারনভূমিতে (বিল, চর) চরে বেড়ায়, তাদের ঘাস কেটে খাওয়াতে হয় না, কৃষি কার্যে ব্যবহৃত হয় না। শুধু দুধ ও বাচ্চা দান করাই ইহাদের কাজ, তাদের সয়েমা বা বিচরণশীল বলা হয়। যে সকল পশু সায়েমা নয় সেগুলো প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তাদের ওপর যাকাতনেই।

হাদীসে রাসূল (সাঃ)- এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

فِی الْغَنَمِ فِیْ كُلِّ اَرْبَعِیْنَ شَاة الی عِشْرِیْنَ ومِأَةٍ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَة فشاتانِ الی مِأتین فان فثلاثُ شِیَاةٍ اِلٰی ثلاثُ مِأةٍ فان زادت علی ثلات مأة ففی كل مأة شاةٌ فان لم تكن اِلَّا تِسْعٌ وثلاثُوْنَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فیها شیئٌ وفی البقرفی كل ثلاثین تبیعٌ وَفِی الْاَرْبَعِیْنَ مُسِنَّةٌ ولَیْسَ عَلَی الْعَوامِلِ شَیْئٌ

"ছাগল ভেড়ায় ৪০ হতে ১২০ পর্যন্ত হলে ১ ছাগল অথবা ভেড়া যদি এর বেশী ১ টিও হয় তবে ২০০ টি পর্যন্ত ২ টি ছাগল, এর বেশী হলে (১ টিও) ৩০০ পর্যন্ত ৩ টি ছাগল, যদি এর বেশী হয় তবে শতকরা ১টি হারে যাকাত দিতে হবে। আর যদি ৩৯ টিও থাকে তবে যাকাত নেই। প্রত্যেক ৩০টি গরুতে একটি এক বছরের বাচ্চা ও ৪০ টি গরুতে ১ টি ২ বৎসরের বাচ্চা যাকাত দিতে হবে। তবে কাজের উট ও গরুতে যাকাত নেই।"

(মেশকাত শরীফের বড় একটি হাদীসের শেষাংশ)

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে বিভিন্ন ইমামগনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় গরু, মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার যাকাতের হার নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

নিম্নলিখিত হারে গরু ও মহীষের যাকাত দিতে হবে-

৩০ টি গরুতে ১টি তবীয়া। (তবীয়া ১ বছরী বাচ্চা)।
৪০ টি গরুতে ২টি মুসিন্নাহ। (২ বছরী বাচ্চা)।
৬০ টি " ২টি " (১বছরীবাচ্চা)।

৭০ টি	"	১টি	"	ও ১টি তবীয়া
৮০ টি	"	২টি	"	
৯০ টি	"	৩টি		তাবীয়াহ যাকাত দিবে।
১০০টি	"	২টি	"	/ " ও ১টি মুসীন/মুসিন্নাহ

এভাবে প্রতি ১০টিতে যাকাতের হিসেব ধর্তব্য হবে এবং শুধু তাবী হতে মুসিন্নাহ ও মুসিন্না হতে তাবীয়াতে পরিবর্তিত হবে [illegible] ও মহীষের যাকাতের বিধান একই।

ছাগল ৪০ টি থেকে ১২০ টি পর্যন্ত হলে ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ১২১ হতে ২০০ পর্যন্ত হলে ২ টি ছাগল এর পর প্রতি শতে ১ টি করে ছাগল দিতে হবে। ২০০টির পর একটি বেশী হলে। ৩ টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ছাগল ভেড়া ও দুম্বার একই নিয়ম।

ঘ. শিল্প-কারখানার ও যন্ত্রপাতির যাকাত

যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবিভাবে যাকাতের আওতায়ভুক্ত হওয়া উচিত। কারণ এসব দ্রব্যাদি উৎপাদনশীল, যন্ত্রপাতির মালিক তাহা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম। কাজেই এসব সম্পদ ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদ্যমান না থাকলেও এসবের ওপর যাকাত আরোপিত হওয়া উচিত। শিল্প যন্ত্রপাতি এবং কাজের নিমিত্ত সাধারণ শ্রমিকের যন্ত্র- যথা কর্মকারের হাতুরী কিংবা কৃষকের লাংগলের মধ্যে পার্থক্য আছে। শেষোক্ত যন্ত্রটি মালিক নিজেই ব্যবহার করে এ ছাড়া কোন উৎপাদন তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং এ যন্ত্র তার জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু প্রথমোক্ত যন্ত্রের ব্যাপারে মালিক নিজে তা ব্যবাহার করে না। সে শ্রমিক নিয়োগ করে কাঁচা মাল ব্যবহার করে

এবং মুসাফার জন্য উৎপাদন করে। কজেই সেখানে যকাত প্রযোজ্য । ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও অতি সাধারণ মানের ছিল এবং কেবল জীবিকা নির্বাহের জন্যই শিল্প কর্ম করা হত। আধুনিক উৎপাদনের প্রক্রিয়া তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই শিল্প যন্ত্রপাতরি ওপর তখনও যাকাত ধার্য করা হত না। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখন শিল্প যন্ত্রপাতির ওপর যাকাত দিতে হবে। কারণ আধুনিক যন্ত্রপাতি অনেকাংশে স্বয়ংক্রিয় এবং উৎপাদনক্ষেত্রে অতি গুরত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করে। ফলে এসবের স্বত্বাধিকারী অন্যান্য সম্পদের মতই যন্ত্রপাতি থেকে– আয় উপার্জন করতে থাকে। উপরোক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী শিল্প যন্ত্রপাতির উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর –১০% হারে যাকাত দেয়া উচিত। কারণ ইসলামী বিধান অনুসারে বিনা পরিশ্রমে যেসব ভূমিতে সেচ সরবরাহ তথা ফসল উৎপাদন সম্ভব, সে সব জমির ফসলের ওপর শতকরা দশভাগ হারে যাকাত দিতে হয়। আমরা নীতিগতভাবে উপরোক্ত রিপোর্টের সংগে একমত। তবে যাকাতের হার নির্ধারণের ব্যাপারে কৃষিজাত দ্রব্যের সংগে এর তুলনা করা ঠিক নয়। কারণ শিল্প যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতির হার কৃষি জমির তুলনায় অনেক বেশী, যাকাতের হার নির্ধারণের সময় তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে যাকাতের হার অপেক্ষাকৃত কম হওয়া বাঞ্চনীয়। তাছাড়া যাকাতের হার শিল্পের উৎপাদন হারের সংগে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। যেহেতু উৎপাদনের হার বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন রকম, কাজেই যাকাতের হার নির্ধারণের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত নমনীয়তা থাকা উচিত।

ডাঃ এম, এ মান্নান রচিত “ইসলামী অর্থনীতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ” বই হতে সংগৃহীত।

৬. খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদ সাধারণত আমাদের দেশে দুর্লভ বা দুষ্প্রাপ্য। তার পরও যে কোন সময় বা যে কোন অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। তাই খনিজ সম্পদের ব্যাপারে ইসলামের কি নির্দেশ আমাদের তা জেনে নিতেহবে।

জমিনে গচ্ছিত গুপ্ত ধনকে (كَنْزٌ) কানজ বলে। আর খনিতে প্রাপ্তসম্পদ – যেমন সোনা, রূপা প্রভৃতি দ্রব্যকে (مَعَادِنٌ) মা'আদিন বলে।

উভয় সম্পদকে একসাথে "রেকাজ" বলে। এ সকল সম্পদের যাকাতকে $\frac{১}{৫}$ অংশ বা খুমুছ বলে।

এ সম্পর্কে হাদীসে রাসূল (সাঃ)– এর বর্ণনা হলোঃ

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرحمٰن عَنْ عمر وَاحِدٍ ان رَسُوْلَ اللّٰه (ص) اقطع لبلال
بن الحارث المزنى معادن القِبَلِيَّةِ وهى من ناحية الْفُرْعِ فتلك
لِلْمعَادِنُ لَاتُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزكوة الى اليوم - ابوداؤد

"জাবেয়ী হযরত রাবীয়া বিন আবদুর রহমান একাধিক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাঃ) বিলাল বিন হারিছ মুজান্নিকে "ফুরয়ে" অঞ্চলের দিকে কাবালিয়া নামক স্থানে খনি সমূহ জাগীর হিসেবে দান করেছিলেন। সে সকল খনির যাকাত ছাড়া (খুমুছ)'আজ পর্যন্ত কিছুই আদায় করা হয়নি।" (আবু দাউদ)

ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে খনির রয়ালটি কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায় উৎপাদনের সংগে সংগেই আদায় করা উচিত। এক বছর সমাপ্তির কোন প্রয়োজন নেই। খনিজ সম্পদের যাকাত আদায়ের ব্যাপারে সম্পদও হতে পারে অথবা সমপরিমাণের মূল্য আদায় করলেও যাকাত আদায়হবে।

এ ধরনের যাকাতই প্রথম দিকে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালকে সমৃদ্ধ করে ছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেনঃ

وكذالك كل أُحِسْبَ فِى المعادن مِنَ الّذهَبِ و الفضهِ والنُّحَاسِ
وَلحديد والرصاص فَإنّ فِى ذالك الخُمُسُ

"এভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও সীসা-দস্তা প্রভৃতি যাবতীয় খনিজ সম্পদ হতে এক পঞ্চমাংশ (খুমুছ) যাকাত আদায় করতে হবে।"

এমনিভাবে ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত সম্পদ হতেও যাকাত আদায় করতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন فى الركاز خمس রেকাজে খুমুছ (এক পঞ্চমাংশ) আদায় করতে হবে। কিতাবুল আমওয়াল এর ৩৩৬ পৃঃ ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেছেন, সমুদ্র হতে যেসব সম্পদ পাওয়া যাবে তাতেও গনীমাতের মতই (খুমুছ) রাজস্ব আদায় করতেহবে।

চ. কৃষিজাত দ্রব্যের যাকাত

আমাদের দেশে যাকাতের প্রচলন কিছুটা আছে, কিন্তু যাকাতের উল্লেখযোগ্য খাত "ওশর" চালু নেই। মুসলমানদের জন্য অতীব

পরিতাপের বিষয় 'ওশর' এর ন্যায় ফরয একটা অর্থনৈতিক ইবাদাত সম্পর্কে কারো তেমন অনুভূতি নেই। আল্লাহ যদি মেহেরবানী করে আমাদের এ জাতিকে মারাত্মক অপরাধ (পাপ) হতে ক্ষমা করেন, তা না হলে আমাদের সম্মিলিতভাবে শাস্তিযোগ্য হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনও অনেক দ্বীনদার ও আলেমকে বলতে শুনেছি যে, আমরা জমিনের খাজনা বা কর দিয়ে থাকি। অতএব 'ওশর' দিতে হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন আমরাতো আনুমানিক 'ওশর' মাদ্রাসা মক্তবে দিয়ে থাকি তাতে ফরয আদায় হয়ে যাবে। অথচ যাকাত ওশরের একই হুকুম, যে খাতে যাকাত দিতে হবে, ঠিক সে খাতেই ওশর দিতে হবে। এমনি ধরনের বিভিন্ন সমস্যা ও বিভ্রান্তি হতে মুসলিম উম্মাহকে বাঁচতে হলে ওশরের ব্যাপারে কুরআন-হাদীস আম্বীয়ায়ে কিরাম দের মতামত ও নির্দেশ জানতে হবে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ওশরের বিবরন দেয়ার চেষ্টা করছি।

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ البقرة

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপার্জনের উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ করো এবং সে সম্পদের মধ্য থেকেও যা আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে উৎপন্ন করেছি।" (আল-বাকারা- ২৬৭ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ الانعام

"তোমরা ফসলের উৎপাদন খাও, যখন তাতে ফল ধারণ করবে এবং আল্লাহর হক আদায় করো, যখন শস্য কাটবে (আহরণ করবে) এবং সীমা লংঘন করো না।" —আনআমঃ১৪১

হাদীসে রাসূল (সাঃ)–এর মাধ্যমেও আমরা ওশর আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারি।

عَنْ عبد الله بن عمر (رض) عن النبى (ص) قال فيما لقت السَّمَاءُ
والعيون عَثْرِيًّا اَلْعُشُرُوَمَا سُقِىَ بالنضم نصف الْعُشُرِ

"আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যা (যে ফসল) আকাশ অথবা প্রবাহমান কূপের পানি দ্বারা অথবা নালার পানি দ্বারা সিক্ত হয় (ফসল উৎপন্ন হয়) তাতে 'ওশর' (এক দশমাংশ) আর যা সেচ দ্বারা সিক্ত হয় তাতে অর্ধ ওশর (বিশ ভাগের এক ভাগ)" —বুখারী শরীফ

হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামেনের শাসন কর্তা নিযুক্ত করে নবী করিম (সাঃ) যে নিয়োগ পত্র দিয়ে ছিলেন তাতে লিখিত ছিলো–

نّ فِيْمَا سَقَت السَّمَاءُ اَوْتَسْقِى غَيْلًا اَلْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالْغَرْبِ
وَالدَّلِيْةِ نصْفُ الْعُشُرَ- فتح البلدن

মুসলমানদের জমি হতে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ আদায় করবে সে ক্ষেত্রে যখন বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে স্বাভাবিক ভাবে সিক্ত হয়, কিন্তু যেসব জমিতে আলাদা ভাবে পানি দিতে

হয় অ হতে এক দশমাংশের অর্ধেক (বিশভাগের এক ভাগ) আদায় করতে হবে। —ফতহুল বুলদান-৮১ পৃঃ

উল্লেখিত কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের আলোকে ওশর আদায়ের গুরুত্ব ও ওশরের নিসাব আমাদের সামনে সুস্পষ্ট।

চ. ওশরের নিসাব

ওশরের নিসাবের ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ থাকলেও ইমামদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহঃ) বলেছেন, জমিতে উৎপন্ন ফসল কম অথবা বেশী হোক নদী-ঝর্ণার পানিতে উৎপন্ন হোক বা বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হোক কোন তারতম্য ছাড়াই এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। শুধু কাঠ, বাঁশ ও ঘাষের যাকাত দিতে হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে পাঁচ ওয়াসাক বা ত্রিশ মনের কম হলে ওশর ফরয হবে না, কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। ওশর ফসলও দেয়া যেতে পারে বা ফলের মূল্যও দেয়া যাবে।

দশঃ ওশরী ও খারাজী জমি

ইসলামের দৃষ্টিতে জমি দু'প্রকারঃ খারাজী ও ওশরী। হানাফিগণের মতে যেসব জমি খারাজী জমি বলে প্রমাণীত হয়, তার খারাজ দেয়া ফরয আর যেসব জমি ওশরী বলে প্রমাণীত হয়

তার ফসলের ওশর দেয়া ফরয। কোন মুসলিমের খারাজী জমি থাকলে তার খারাজ দেয়া ফরয ওশর দেয়া ফরয নয়। একই জমির উপর খারাজ ও ওশর উভয় ফরয হয় না। হানাফিগণের মতে যে কোন জমি দু'পন্থায় ওশরী হয়। একঃ কোন শহর অথবা দেশের অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের জমি ওশরী হয়ে যায়, যেমন মদীনা অথবা ইয়ামন অথবা গোটা আরব দেশের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে তাদের সব জমি ওশরী বলে পরিগণিত হবে। দুইঃ মুসলিমগণ কোন অমুসলিম দেশ জয় করার পর মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অধিকৃত জমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দিলে সে জমি ওশরী হয়ে যায়, যে কোন জমি ওশরী হওয়ার পর তা উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী মুসলিম বংশধরের মালিকানায় গেলে অথবা এক মুসলিম অন্য মুসলিম থেকে ওশরী জমি খরিদ করলেও তা ওশরী থাকে।

হানাফীগণের মতে যে কোন জমি চার পন্থায় খারাজী হয়। একঃ মুসলিমগণ কোন অমুসলিম দেশ যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করে নেয়ার পর মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেখানকার জমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন না করে অমুসলিমদের মালিকানায়ই রেখে দিলে সে জমি খারাজী হয়ে যায়। দুইঃ কোন অমুসলিম দেশের অধিবাসীরা বিনা যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে সন্ধি করার পর স্বেচ্ছায় জিম্মি হয়ে গেলে তাদের জমি খারাজী হয়ে যায়। কারণ এ দু'অবস্থায়ই মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উক্ত জমির উপর খাজনা ধার্য করা হয়। এভাবে খারাজী জমি উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তী অমুসলিম বংশধরের মালিকানায় গেলে তা খারাজীই থাকে। তিনঃ কোন মুসলিম কোন অমুসলিম থেকে খারাজী জমি

খরিদ করে নিলে তা খারাজীই থাকে ওশরী হয় না। চারঃ কোন অমুসলিম কোন মুসলিমের কাছ থেকে ওশরী জমি খরিদ করে নিলে তা খারাজী হয়ে যায়, ওশরী থাকে না, (মাওলানাঃ সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী লিখিত ওশরের শরীয়তী বিধান বই হতে সংগৃহিত)।

এগারঃ বাংলাদেশের জমি ওশরী কিনা

হানাফীদের মতে মুসলিমদের মালিকানাভূক্ত জমি মূলত ওশরীই হয়। যদি খারাজী হওয়ার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তা খারাজী হয়। কারণ মুসলিম জাতির উপর মূলত ওশর ও যাকাতের হুকুমই আরোপিত হয়, খারাজের হুকুম নয়, শরীয়াতে খারাজের হুকুম অমুসলিমদের উপর আরোপিত হয় কারণ তাদের উপর ওশর ও যাকাতের হুকুম আরোপ করা যায় না। এজন্য মুসলিমদের জমি খারাজী হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ওশরী গণ্য করাই শরীয়াতের বিধান। কাজেই মুসলিমদের যে জমি সম্পর্কে এ কথা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় না যে, তা প্রথমে ওশরী কি খারাজী ছিল–সে জমি ওশরীগণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

উল্লেখিত মৌলিক নীতি সমূহের আলোকে বাংলাদেশের মুসলিমদের জমি জমা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মুসলিমগণ এদেশকে জয় করেছিলেন এবং মুসলিম বাদশাহগণ এদেশের বহু জমি নিজেরা চাষাবাদ করেছেন। আবার মুসলিম অভিযান কালে বহু এলাকার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে সে সব জমিকে ওশরী বলে অবশ্যই গণ্য করা উচিত

জমির সকল প্রকার নিয়ম নীতি আলোচনা করার পর ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও উলামায়ে কেরামের মত হল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মুসলমানদের মালিকানায় যেসব জমি আছে তা ওশরী।

বারঃ যাকাত ও ওশরের পার্থক্য

ওশর জমির যাকাত বটে। কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত থেকে স্বতন্ত্র। তাই ইসলামে ওশরকে যাকাত থেকে ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে ওশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছেঃ-

(১) ওশর দেয়ার জন্য ফসলের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। জমির ফসল বাড়ীতে এনে পরিমাপ করার সংগে সংগেই সে ফসলের ওশর ওশর দেয়া ফরয হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। এ পার্থক্যের কারণে বছরে বিভিন্ন মৌসুমে যে কয়টি ফসল পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে ওশর ফরয হয়।

(২) ওশর ফরয হওয়ার জন্য ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বাকী থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। কিন্তু ওশর আগে দান করার পর ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

(৩) ওশর ফরয হওয়ার জন্য সুস্থ্য ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া (আকেল ও বালেগ হওয়া) শর্ত নয়, নাবালেগ ও পাগল ব্যক্তির

ফসলেও ওশর ফরয হয়, কিন্তু তাদের সম্পদে যাকাত ফরয হয় না।

(৪) ওশর ফরয হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়। শুধু ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। যদি কোন মুসলিম অন্য কারো জমি বর্গা অথবা ইজারা নিয়ে ফসল উৎপন্ন করে অথবা ওয়াকফ কৃত জমি চাষ করে ফসল পায় তবে তাতে ওশর ফরয হয়। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত।

তেরঃ যাকাত ব্যয়ের খাত

মুসলমানদের সকল সম্পদের যাকাত-- গৃহপালিত পশু, সোনা রূপা ও মুদ্রা, ব্যবসায়ের মাল, খনিজ সম্পদ ও ওশর আদায় এবং তার ব্যয়ের খাত স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন পাকে এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে-

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ التوبة

যাকাতের সম্পদ শুধু মাত্র ফকীর মিসকীনদের জন্য আর যারা যাকাত আদায়ের কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত, মুয়াল্লাফাতে কুলুবদের জন্য (মন আকৃষ্ট করার জন্য), ক্রীত দাস মুক্ত করার জন্য, ঋণগ্রস্তদের ঋণ মুক্ত করার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় ও নিঃস্ব মুসাফীরদের জন্য, ইহা আল্লাহর নির্ধারিত ফরয, আল্লাহ সর্বজ্ঞ সুকৌশলী।

উল্লেখিত খাত সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো।ঃ

(১) **ফকীরঃ**— যারা একেবারেই নিঃস্ব সহায় সম্পদ বলতে কিছুই নেই প্রয়োজন পূরণে এরা অন্যের নিকট হাত পাততে বাধ্য হয়।

(২) **মিসকীনঃ**— এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার সামান্য সম্পত্তি আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। স্বাভাবিক জীবন যাপনে টানাটানি হয় ও কোন কিছু চাইতেও পারে না এমন লোককে মিস্‌কীন বা গরীব ভদ্রলোক বলা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) কর্মক্ষম অথচ বেকার লোকদেরকেও মিসকীনদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

(৩) **যাকাত বিভাগের কর্মচারীঃ**— এ বিষয়টি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাদেরকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করা হবে তাদের বেতন দেয়ার কথা বুঝানো হচ্ছে। যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের বেতন যাকাত থেকে দেয়া যাবে।

(৪) **মন জয় করার কাজেঃ**— এখানে সমস্যাযুক্ত নওমুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ নিয়ম চালু ছিলো, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তা রহিত হয়ে যায়। প্রয়োজন হলে আবার ইহা চালুও হতে পারে।

(৫) **দাস মুক্তির জন্যঃ**— এ পদ্ধতি রাসূল (সাঃ) এর পর থেকে আর চালু নেই। কেননা তিনি নিজেই দাস প্রথা রহিত করে

গিয়েছেন। জরিমানার টাকার অভাবে যারা জেলে আটক থাকে তাদের মুক্তির জন্যও যাকাত দেয়া যেতে পারে।

(৬) **ঋণীর ঋণ পরিশোধ করতেঃ**— এমন ব্যক্তি যে ঋণী অথচ ঋণ পরিশোধ করার মতো তার কোন সামর্থ নেই। এমন ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে।

(৭) **আল্লাহর পথেঃ**— এখানে কুরআনের ভাষায় فى سبيل الله দাঁড়ায় جهاد فى سبيل الله এর অর্থ অনেক ব্যাপক, এখানে জরুরী কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করছি যেমন–

(ক) মুসলমানদের যাবতীয় নেক কাজকে আল্লাহর পথে বলা যায়।

(খ) যে মুজাহিদ অর্থাভাবে যুদ্ধে যেতে অক্ষম তাকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।

(গ) যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করতে টাকার অভাব হলে সে ক্ষেত্রে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।

(ঘ) ইসলামকে বিজয়ী করার কাজে যারা নিয়োজিত তাদের আর্থিক দুর্বলতা দূর করার জন্য যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।

(ঙ) ইকামাতে দ্বীনের সার্বিক কাজই ফি সাবিলিল্লাহর কাজ। তাই এ কাজে ব্যয় করার জন্য যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে। সর্বোপরি মুসলমান ও ইসলামের এ চরম দুর্দিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা তথা ইকামাতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত ইসলামী সংগঠনে যাকাত দেয়া অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামের মতে

সর্বোত্তম। যাকাতের বাধ্য বাধকতা বা ফরযিয়াত তখনি আমরা যথাযথভাবে পালন করতে পারবো যখন এদেশে ইসলামী অনুশাসন পুরোপুরি চলবে। তাই এ অনুশাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফি সাবিলিল্লাহর এ খাতের গুরুত্ব সর্বাধিক মনে করা উচিত।

৮। প্রবাসী মুসাফীরঃ– যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে সম্পদ শালী কিন্তু মুসাফীর অবস্থায় অর্থাভবে পথচলা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।

এ সকল খাত ও বিধান আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব এতে কারো দ্বিমত পোষণ করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ কর্ম সম্পর্কে অবগত রয়েছেন এবং তিনি শুধু জ্ঞানীই নন বরং সর্বজ্ঞ।

চৌদ্দঃ কাকে এবং কোন খাতে যাকাত দেয়া যাবেনা

নিম্ন লিখিত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে যাকাত দেয়া যাবে নাঃ

যিম্মীঃ– মুক্তির জন্য অমুসলিম দাস ক্রয়, ছাহেবে নিসাব, যাকাতদাতার বাপ দাদা মা দাদী এবং এর উর্ধতন বংশধরকে এবং সন্তান, নাতী, নাতনী সহ অধস্তন বংশধরকে আর নিজের স্ত্রীকে (ইমাম আবু হানিফার মতে স্ত্রী স্বামীকেও) যাকাত দিতে পারবেনা।

মুক্তিপন আদায়ের চুক্তিবদ্ধ নিজ ক্রীতদাসকে, নিজ মালিকানাধীন দাস, দাসীকে, ধনীর দাস, ধনীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে না।

কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রের কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না। (হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত জাফর ও হযরত হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব প্রমুখ সাহাবাগণের বংশধরদেরকে বনী হাশিম বলে) এ সকল বংশের দাস দাসীগণকেও যাকাত দেয়া যাবে না।

যাকাত আদায়ের শর্ত হচ্ছে- "তমলিক" অর্থাৎ যাকে যাকাত দেয়া হবে তাকে পরিপূর্ণ সত্ত্বাধিকার সহ দান করতে হবে। সুতরাং যাকাতের টাকা দিয়ে ভালো খাদ্য তৈরী করে বাড়ীতে ডেকে এনে গরীব মিসকীনদেরকে খাইয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে না। তদ্রূপ পুল বা সাঁকো নির্মাণ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ডাক্তার খানা, মুসাফীরখানা নির্মাণ, খাল বা পুকুর খনন প্রভৃতি জন কল্যাণ মূলক কাজে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। তবে কোন গরীব ব্যক্তি যাকাত গ্রহণ করে তা দিয়ে স্বেচ্ছায় এসব কাজ করে দিলে তাতে কোন সমস্যা হবে না। (নেজামে যাকাত)।

আমাদের দেশে সাধারনত দেখা যায় যে মসজিদ মক্তব, মাদ্রাসা ও দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে যাকাত দেয়া হয়। অথচ এ সকল প্রতিষ্ঠানে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না।

পনেরঃ যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

এ পর্যন্ত আমি যাকাতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ মালী ইবাদাতের ব্যবহারিক দিকের উপর আলোচনা করেছি। বস্তুত এ ইবাদাতকে কিভাবে যথাযথ আদায় করা সম্ভব সে ব্যাপারে অবশ্যই বিরাট জিজ্ঞাসা রয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে

যেমনিভাবে মুসলমানরা যাকাতের ব্যাপারে উদাসীন, ঠিক তেমনিভাবে যাকাত আদায় করা হবে কিভাবে বা এর পদ্ধতি কি এ বিষয়েও যথেষ্ঠ অজ্ঞতা রয়েছে। আমরা সচরাচর দেখতে পাই যে নামায সম্পর্কিত ছোট খাটো বই বাংলায় বের হলেও তাতে নামায আদায় করার বিস্তারিত বিবরণ লিখা রয়েছে। কিন্তু যাকাত সম্পর্কে তাতে কোন বিস্তারিত বিবরণ নাই।

নামাযের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের ব্যাপারেও ইসলাম সমান গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাই যাকাত আদায়ের পদ্ধতি জানতে হলে যাকাত ফরয হওয়ার পটভূমি, যৌক্তিকতা, অর্থনৈতিক মূল্য, সামাজিক ও রাষ্টীয় গুরুত্ব অনুধাবন করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নিতে পারলেই যাকাত আদায়ের পদ্ধতি আমাদের নিকট সহজ ও সুস্পষ্ট হবে।

এখানে যাকাত আদায়ের যথার্থ পদ্ধতি অনুসরনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেনঃ–

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا التوبة ·

"হে নবী, তাদের সম্পদ হতে যাকাত উশুল করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন।" তাওবাঃ ১০৩

অন্যত্র ঘোষণা করেছেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ الحج

তারা হচ্ছে সে সব লোক যাদের আমি রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে, আর মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে —আল হাজঃ ৪১)

আরো উল্লেখ রয়েছেঃ-

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝ الذّٰرِيٰت

আর তাদের (ধনীদের) ধন সম্পদের বঞ্চিত ও প্রার্থনা-কারীদের অধিকার (প্রাপ্য) রয়েছে।

নবী করিম (সাঃ) বলেছেনঃ-

عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لَاجَلَبَ
وَلَاجَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلَّا فِيْ دُوْرِهِمْ - ابوداؤد

আমর বিন শুয়াইব তাঁর পিতা অত,পর তাঁর দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, جَلَبَ আনানো (অর্থাৎ যাকাত উশুলকারী কর্মচারী কর্তৃক দা'তাকে দূর থেকে যাকাতের মাল হাজীর করতে বলা ও সরানো جَنَبَ (অর্থাৎ যাকাতদাতা সম্পদ দূরে রেখে কর্মচারীদেরকে তথায় যেতে বলা) কোনটিই সিদ্ধ নয়। যাকাত দাতার বাড়ী ছাড়া উশুল করা যাবে না —আবু দাউদ

নবী করিম (সাঃ) আরো বলেছেন-

তোমাদের বিত্তবানদের থেকে যাকাত উশুল করে তোমাদের দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন করার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ ও হাদীসের আলোকে যাকাত আদায়ের পদ্ধতি আমাদের নিকট মোটামুটি অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। তবুও আরো কিছু বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণাংগ ধারণা নেয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, আল্লাহ তায়ালার সরাসরি নির্দেশ রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বাস্তবায়িত যাকাত আদায়ের পদ্ধতি ও বন্টন রীতি আমাদের প্রত্যেকেরই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তাছাড়া রাসূল (সাঃ) নিজেও বলেছেন, "আমাকে যাকাত আদায় করে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় করার জন্য পাঠানো হয়েছে। অতএব এ কথা পরিষ্কার যে, যাকাত একাকী আদায় নয় বরং সামষ্টিকভাবে আদায় ও সামষ্টিকভাবে বন্টন করতে হবে।

আল্লাহর সে নির্দেশের আলোকে (যাদেরকে আমি রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম ও যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে) এ কথাও সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের রাষ্ট্র প্রধান বা ইমাম বা খলিফা সকলের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবেন এবং সামষ্টিকভাবে তা ব্যয় করবেন। এর বাস্তবায়ন রাসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে আমরা বাস্তবে দেখেছি। কিন্তু এ ধরনের ইসলামী রাষ্ট্র বা ইমাম আমাদের সমাজে নেই বলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ দেশের মুসলমান কিভাবে যাকাত আদায় করবে? প্রকৃতপক্ষে এ দেশের মুসলমানদের এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বেখবর থাকার কারণেই তাদের মনে এরূপ প্রশ্ন জাগ্রত হয়। তারপরও সুখের বিষয় যে, তাদের চেতনার জাগরণ ঘটছে।

এমতাবস্থায় কোন ইসলামী সংস্থা বা ইকামাতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত কোন ইসলামী জামায়াত অথবা মুসলমানদের

সামষ্টিক কোন সংগঠন যাকাত আদায় করবে। এবং কুরআনে নির্ধারিত খাতে তা ব্যয় করবে। কুরআন হাদীসের আলোকে ওলামায়ে কিয়াম ও ইসলামী চিন্তাবীদদের সর্ব সম্মত মত যে, এ ধরনের সংস্থা বা জামায়াতের হাতে যাকাত প্রদান ও বন্টনের দায়িত্ব অর্পণ করা মুসলমানদের উচিত। নতুবা ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিলে যাকাতের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না।

বর্তমানে যে নিয়মে যাকাত দেয়া হচ্ছে তাতে দাতা অনুগ্রহ করে দিচ্ছে এবং গ্রহীতা অসম্মানজনক ভাবে দয়া হিসেবে পাচ্ছে। অথচ যাকাত দাতার কর্তব্য মনে করে দেয়া উচিত এবং গ্রহীতা তার হক পাচ্ছে বলে বোধ করা উচিত।

ষোলঃ সামষ্টিকভাবে যাকাত আদায়ের সুফল

ইসলামের নির্দেশ অনুসারে সামষ্টিকভাবে যাকাত আদায় করলে তা সামাজিকভাবে কত যে কল্যাণকর একটি উদাহরণ হতে আমরা তা বুঝতে পারবো। মনে করুন একটি উপজেলাতে ২০ জন যাকাত দাতা ৫ লাখ টাকা যাকাত স্থানীয় একটি সংস্থাতে জমা দিল। উক্ত সংস্থা ঐ উপজেলাতে যাকাত পেতে পারে এমন ৫০ জন লোকের তালিকা তৈরী করলো। সংস্থা চিন্তা করল উক্ত ৫০ জনের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা পুরণকরা তাদের দায়িত্ব। উক্ত লোকদের শ্রেণী বিন্যাস করে ৩ সালা পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হলো। এতে ১০ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন (১০X৩০০০=৩০,০০০), ১০ জন যুবককে রিকসা (১০X৭০০০= ৭০,০০০) ১০ জন অক্ষম ব্যক্তিকে পানের বাকস

(১০X৫০০০=৫০,০০০) ক্রয় করে দিলো। এদের তত্ত্বাবধানের জন্য আরো ২ জন লোককে চাকুরী দেয়া হলো (বেতন দিয়ে)। উপজেলার গরীব জন গণের চিকিৎসার জন্য চার অঞ্চলে ৪টা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হলো। (৪X২৫০০০=১,০০,০০০) শিক্ষার সুবিধার জন্য চার এলাকায় ৪টি বয়স্ক/অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হলো, (৪X২৫০০০=১,০০,০০০), ইসলামী জ্ঞান দানের জন্য চার কেন্দ্রে ৪টি ইসলামী পাঠাগার স্থাপন করা হলো (৪X১০,০০০=৪০,০০০), বাকী টাকা মহিলা এবং অসহায়দের খাওয়া ও কাপড়ের ব্যবস্থা করা হলো সাময়িকভাবে।

অতএব, দেখা যাবে প্রতি বছর যথাক্রমে ৪০/৫০ জন লোক স্বাবলম্বী করতে পারলে ৩ বৎসরে ১৫০ জন লোককে আর যাকাত দিতে হবে না। তাছাড়া শিক্ষা, চিকিৎসা ও ইসলামী দর্শনের দিক থেকে এ উপজেলা ৪র্থ বছরে আদর্শ উপজেলার মানে উন্নিত হবে। এভাবে আমরা সামষ্টিক ভাবে যাকাত আদায় করে উক্ত পদ্ধতিতে অধিক সুফল পেতে পারি। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায়ে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে যেমন–

১। লোক দেখানো রিয়া বা প্রদর্শনীর ভাব সৃষ্টি হয়।
২। যাকাত দিয়ে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা বুঝায়।
৩। যাকাত আদায় না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
৪। যাকাত গ্রহীতার নিজকে হেয় মনে করার কারণ ঘটে।

তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে যাকাত প্রদানে মারাত্মক সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি হয়। যেমন– কোন ব্যক্তি ঘরে বসে ৫০ হাজার

টাকার যাকাতের কাপড় বিতরণ করলে যাকাতের হকদাররা সঠিকভাবে পায় না। উপরন্তু পরবর্তী বছর দ্বিগুণ প্রার্থী যাকাত গ্রহণ করতে আসবে এবং তার পরের বছর আরো দ্বিগুন প্রার্থী যাকাতের মাল নিতে আসবে। কারন বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটিই স্বাভাবিক। ফলে সমাজে প্রতি বছরই ফকির মিসকিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। অধিকন্তু স্বল্প সময় ও পরিসরে অধিক লোকের সমাগমে ও চাপে মারাত্মক দুর্ঘটনার সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। যার জ্বলন্ত প্রমাণ গত ২৮শে রামাদান/৫ই মে শুক্রবার তারিখে চাঁদপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাবেক প্রধান মন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর বড় ভাই ডাঃ ফজলুর রহমান চৌধুরীর বাস ভবনে ১৮/১৯ জন অসহায় মহিলার প্রাণ হানি এবং ৬০/৭০ জন আহত হওয়ার মর্মবিধারক খবর দৈনিক সংগ্রাম দৈনিক ইত্তেফাক ২৩ শে বৈশাখ ১৩৯৬, ৬ই মে ১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়। ঢাকাতেও কয়েক বছর পূর্বে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

সতেরঃ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ে যাকাতের ভূমিকা

ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য এক মহা মুল্যবান রহমত ও নিয়ামত। তাই এ রাষ্ট্রের বিরাট জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য বিপুল অর্থ সম্পদ আবশ্যক। যাকাত হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থার মেরুদন্ড। এ ছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য কুরআন মজীদে রাষ্ট্রীয় আয়ের নিম্ন লিখিত উপায় সমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

১। যাকাত, সাদকা, ওশর, ভূমি রাজস্ব খনিজ সম্পদের রয়ালটি ইত্যাদি

২। বিজাতীয়দের নিকট হতে বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত ধন সম্পদ, জিজিয়া, গণীমত, খারাজ ও জমির খাজনা।

৩। দেশের সামষ্টিক প্রয়োজন পুরণের জন্য নাগরিকদের নিকট হতে আদায় কৃত অর্থ।

নবী করিম (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন আরো কয়েকটি খাতে রাষ্ট্রের আয় নির্ধারণ করেছেন। সর্বোপরী সব ধরনের আয়কে পরিমাণের দিক দিয়ে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) ভূমি রাজস্বঃ- ওশর, ওশরের অর্ধেক, খারাজ।

(খ) খুমুছঃ- গনীমাতের মাল, খনিজ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ ইত্যাদি

(গ) জিজিয়া ও নাগরিকদের নিকট হতে লব্ধ টাকা। (জিজিয়া, খারাজও নাগরিকদের নিকট হতে আদায়কৃত অর্থের হার ও পরিমাণ ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট বা শুরা নির্ধারণ করবে)।

(ঘ) মালিক বিহীন বা উত্তরাধিকারীহীন ধন সম্পত্তির পুরোটাই রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালে জমা হবে।

উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, যাকাত ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় কতটুকু ভূমিকা

রাখে। বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় আয়ের আনুমানিক ৭৫% যাকাত হতে সংগৃহীত হয়। অতএব যে রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় কল্যাণ রাষ্ট্র বলা হয়, সে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের অভাব একমাত্র যাকাতই পূরণ করতে সক্ষম। ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর শাসনামলে যাকাত গ্রহণ করার মত একজন ব্যক্তিও ছিলনা। অথচ প্রাক ইসলামী সমাজের অর্থনৈতিক দৈন্যের কথা কারোই অজানা নয়।

আঠারোঃ যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্য

ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম যে, যাকাত যেমনিভাবে ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদাত সমূহের অন্যতম। তদ্রূপ সুনিয়মিতভাবে আদায় করাও প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তির উপর আইনত একান্ত কর্তব্য। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরছি।

পুঁজিবাদী সমাজের অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সুদ, তেমনিভাবে কমিউনিষ্ট সমাজের অর্থনীতির বুনিয়াদ হচ্ছে সম্পত্তির জাতীয়করণ। তদ্রূপ ইসলামী সমাজেও যাকাত অর্থনীতির মুল বুনিয়াদ। অথচ একদিকে ধর্মীয় ব্যবস্থা অন্য দিকে অর্থব্যবস্থা। এ উভয় দিক থেকে যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন না করায় বর্তমান সমাজের লোক এর প্রতি উপেক্ষা ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করছে। এক শ্রেণীর লোক ইহাকে মধ্যযুগীয় খয়রাতী ব্যবস্থা মনে করে ঘৃণা পোষণ করছে। অন্যভাবে আধুনিক বস্তুবাদী অর্থনীতিবিদগণ যাকাতের অর্থনৈতিক মূল্য স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত নন। এর কারণও সুস্পষ্ট।

প্রথমত, যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা তারা দুনিয়ার কোথাও দেখছে না। যারফলে এর বাস্তব ও ব্যবহারিক মূল্য সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হয়ত যাকাত ব্যবস্থাকে একটি নীতি বা থিউরী হিসেবে তারা কখনও পর্যালোচনা ও গবেষণা করে তার অর্থনৈতিক মূল্য যাচাই করে দেখেনি বরং দেখেছে ধনী লোকদেরকে ভিখারীদের মধ্যে যাকাত আদায়ের বিলাসীতার মাধ্যমে সম্মান, প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভ করতে, যার দৃশ্য দেখে অনেক চিন্তাশীল ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাকাতের কল্যাণ কারিতা ও অর্থনৈতিক মূল্য বুঝতে সক্ষম হন। যাকাত যে দান নয় এবং ইহা আদায়ের বর্তমান পদ্ধতি যে ভুল ও ইসলাম বিরোধী এবং এক উন্নত নির্ভুল ও সুষ্ঠু পন্থায় যাকাত আদায় করাই যে ইসলামের নির্দেশ এসব কথা জানতে পারলে নিশ্চিয়ই লোকদের বর্তমান ধারণার পরিবর্তন হবে।

ইসলাম মানুষকে ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। তাই লাগামহীন ও অবৈধভাবে এবং মানবতা বিধ্বংসী নীতি সুদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করাকে ইসলাম প্রশ্রয় দেয়নি বরং হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে–

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝ البقرة

আল্লাহ্ সুদকে নির্মুল নিশ্চিহ্ন করে দেন আর সাদকায় ক্রম বৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ (সুদ খোর) পাপী লোকদেরর মাত্রই পসন্দ করেন না। —আল—বাকারাঃ ২৭৬

যাকাত ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পুরণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা। বস্তুত জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পুরণ করে স্থায়ী নিরাপত্তা দানে যাকাত "বীমা" বিশেষ এবং প্রত্যেক নাগরিকের খাওয়া, পরা, থাকা, শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ যাকাত ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল। কোন বিশেষ বা কোন এক গোষ্ঠির মধ্যে জাতির সম্পদ সীমাবদ্ধ থাকুক এটা ইসলাম অনুমোদন করে না। এমনকি দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সহ অর্থ উৎপাদনের সকল উৎস মাত্র কতিপয় লোকের হাতে নিয়ন্ত্রিত হবে এটাও ইসলাম সমর্থন করে না। একমাত্র সুষ্ঠু যাকাত ব্যবস্থা ও ইসলামী রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। সুতরাং যাকাত ও যাকাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির মূল পুঁজি।

উনিশঃ যাকাত আদায়ের মৌসুম

যাকাত আদায়ের নির্ধারিত কোন মাস নেই। সাহেবে নিসাব যখন তার আর্থিক বছর শেষ হবে তখনি যাকাত আদায় করবে। তারপরও প্রায় দেখা যায় আমাদের দেশে পবিত্র রামাদান মাসেই অধিকাংশ লোক ৭০ গুণ বেশী সওয়াবের আশায় যাকাত আদায় করে থাকে। আর কেউ কেউ অন্যান্য সময়েও যাকাত আদায় করে থাকে।

এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে অথচ কল্যাণকর কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করে তা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

পবিত্র মাহে রামাদানের মর্যাদা ও গুরুত্ব মুসলিম মিল্লাতের নিকট সুপরিচিত। মুসলিম বিশ্বের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে

বাংলার মুসলমানও এ মাসের মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা করে এবং সিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। রামাদান মাসের তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ البقرة

মাহে রামাদান এমন মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন বিধান এবং সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপুর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং সত্য ও মিথ্যায় পার্থক্য বর্ণনা করে।

অন্যত্র বলা হয়েছে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ (আল কুরআন) সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত করবে যারা মুত্তাকী তাদেরকে।

রামাদান মাসের লক্ষ্য বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ البقرة

হে ঈমানদারগন! তোমাদের উপর তোমাদের পুর্ববর্তীদের ন্যায় রোযা ফরয করা হয়েছে এ অর্থে যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। —আল বাকারাহ)

সুরায়ে কদরে বলা হয়েছে– اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

"অবশ্যই আমি কদরের রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছি।"

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

সে কদরের রাত হাজার মাসের (রাত্রির) চাইতেও উত্তম।

উল্লেখিত আয়াতগুলো হতে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, পবিত্র মাহে রামাদান বছরের যে কোন মাসের চাইতে অনেক অনেক বেশী মর্যাদাবান। এ মাসের কয়েকটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যেমন–

(ক) এ মাস কুরআন নাযিলের মাস।

(খ) এ মাস লায়লাতুল কদরের মাস যা হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।

(গ) এ মাসে জান্নাতের সকল দরজা খোলা ও জাহান্নামের দরজা বন্ধ রাখা হয়।

(ঘ) এ মাসে প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব ১০ হতে ৭০০, ৭০০ হতে ৭০০০ গুণে বর্ধিত করে দেয়া হবে।

(ঙ) এ মাসেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (যাতে অংশ গ্রহণকারীগণ (সাহাবী) জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন।

(চ) এ মাসের সিয়াম সাধনায় আল্লাহ্ অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

(ছ) এ মাসে শয়তানের সব নেতাদেরকে বন্ধী করে রাখা হয়।

(জ) এ মাসে তাকওয়া ও আল্লাহ্ প্রেমের জোয়ার আসে, বিশেষভাবে কুরআন থেকে হেদায়েত পেতে হলে মুত্তাকী হওয়া শর্ত; আর–মুত্তাকী তৈরীর মৌসুম রামাদান মাসকে বলা হয়।

অতএব এমনি এক গুরুত্বপুর্ণ মর্যাদাবান, আত্মগঠনের মাস মুসলিমদের জীবনকে রহমাত, মাগফিরাত ও নাজাতের আশায় কর্ম তৎপর করে দেয়। তাই এ মাসকেই যাকাত আদায়ের মাস হিসেবে যদি আমরা গ্রহণ করি তবে যাকাতের ফরযিয়াতের সাথে সাথে বহুগুণ বেশী সওয়াব পাওয়ার এ মহা সুযোগ পাওয়া সম্ভব হবে। সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদার মাস হিসেবে যাকাতের মাধ্যমে এ মাসকে আরও সুশোভিত করে তুলতে পারি, তবেই আশা করা যায় পরকালেও মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যানময় করে তুলবেন। এ ছাড়াও সমাজের যাকাত গ্রহীতা ব্যক্তিরাও তাদের অভাব ও সমস্যা পুরনের মাধ্যমে এ মাসে নিজেদের ইবাদাত বন্দেগী যথাযথভাবে আদায় করতে আগ্রহ ও উৎসাহ পাবে।

“পরিশিষ্ট”

১। সোনা বা রূপা দ্বারা প্রস্তুত জিনিস গহনা, তৈজষ পত্র, ফার্ণিচার ইত্যাদির উপর ঐ পরিমাণে যাকাত ফরয ও ব্যবহারে থাকুক বা নাই থাকুক।— কাঞ্জ

২। সোনা রূপার মধ্যে যেটি দেশে অধিক প্রচলিত সেটির সাথেই মূল্য নির্ধারণ করবে। (আমাদের দেশে রূপাই অধিক প্রচলিত) কিন্তু উহাতে যদি নিসাব পূর্ণ না হয়, তবে অপরটির সাথেই নির্ধারণ করবে। অন্য কথায় যেটিতেই দরিদ্রের অধিক উপকার হয় উহার সাথেই নির্ধারণ করবে।— দুররে মুখ্তার

৩। মুদ্রা বা গহনা ইত্যাদি, যে সকল জিনিসে সোনা বা রূপার পরিমাণই অধিক সে সকল জিনিস সোনা বা রূপা

হিসেবেই গণ্য হবে। সুতরাং উহাতে সোনা বা রূপার যাকাতই ফরয। সোনারূপা ও খাদের পরিমাণ সমান হলে উহাতেও সাবধানতা (এহ্তিয়াৎ) হিসেবে যাকাত দেয়া কর্তব্য —দুররে মুখতার ও শামী)

৪। কাহারো নিকট পাওনা টাকার উপর যাকাত দেয়া ফরয, যদি দেনাদার উহা স্বীকার করে এবং আদায়ের অংগীকার করে অথবা নিজের নিকট উহা উশুলের উপযুক্ত দলিল প্রমাণ থাকে।

৫। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা যখন উসূল হবে কেবল তখন হতেই উহার যাকাত দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর বিভাগ মতে দাইনে জঈফ ভূক্ত। তবে পূর্ব সময়ের যাকাত দেয়া উত্তম। —এমদাদুল ফতোয়া–২য় খন্ড, ৬৪৫ পৃঃ

৬। কোন কারখানা বা কোম্পানীতে দেয়া শেয়ার মূল্যের যাকাত দেয়া ফরয। তবে উহার যত অংশ কল কব্জা ইত্যাদি উপকরণ বাবদ খরছ হয়েচে উহার যাকাত দেয়া লাগবে না। নেজামে যাকাত।

৭। যাকাত যোগ্য বিভিন্ন প্রকারের মাল আছে যথা–সোনা, রূপা, সোনা রূপার গহনা, নগদ টাকা, পণ্য দ্রব্য বা শেয়ার কিন্তু একা কোনটিই নেসাব পরিমাণ নহে। যদি সকল প্রকার মিলিয়েও নেসাব পরিমাণ হয় উহাতে যাকাত ফরয।

৮। বছর পূর্ণ হবার পূর্বে অগ্রীম যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ইত্যবসরে মাল ফওত হলে অথবা খরচ হয়ে গেলে উহার নফল সাওয়াব পাওয়া যাবে।

৯। যাকাত দেয়া কালে যাকাত আদায় করছে বলে মনে মনে নিয়ত করা ফরয। দেয়া কালে নিয়ত না করা হলে অন্তত গ্রহীতা উহা খরচ করে ফেলার পূর্বে নিয়ত করলেও চলবে। কিন্তু নিয়তের সাথে যাকাতের টাকা পৃথক করে রাখলে পরে উহা দেয়া কালে নিয়ত না করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

১০। যাকাত দাতা কোন ব্যক্তির হাতে যাকাত দিয়ে বলল তুমি ইহা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিও। সে উহা যে পর্যন্ত বিতরণ না করবে সে পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দিলেও হবে না, অথবা নিজে উহা খরচ করে পরে নিজের টাকা হতে আদায় করলেও হবে না।

১১। সম্পূর্ণ যাকাত এক ব্যক্তিকেও দেয়া যেতে পারে এবং অনেকের মধ্যে ভাগ করেও দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এক ব্যক্তিকে অন্তত ঐ পরিমাণ দেয়া উত্তম যে পরিমাণ দ্বারা সে ঐ দিনের জন্য কারো মুখাপেক্ষী হবে না। এরূপে এক ব্যক্তিকে ঐ পরিমাণ দেয়াও মাকরূহ যে পরিমাণের উপর যাকাত ফরয। কিন্তু দেয়া হলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।–নেজামে যাকাত, মুফতীশফী

১২। যাকে যাকাত দেয়া হয় তাকে এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, উহা যাকাত বরং না বলাই উত্তম। মনে মনে নিয়ত করাই যথেষ্ট।

১৩। বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। দেরি করা গুনাহ্। হঠাৎ মওত এসে গেলে উহা ঘাড়ে থেকে যাবে আর মাল অপরে খাবে।—দুররে মুখতার।

১৪। যে ব্যক্তি মানুষের হক দেনা রয়েছে অথবা আল্লাহর হকের মধ্যে অতীত অনাদায়ী যাকাত দেনা রয়েছে, তার উপর যাকাত ফরয নহে। দেনা আদায় করাই ফরয। যদি তার যাকাত যোগ্য সম্পদ দেনার অধিক না হয়। সম্পদ অধিক হলে এবং তা নেসাব পরিমাণ হলে উহাতে যাকাত ফরয। জমিনের খাজনা ও জমিনের টাকা এ দেনার অন্তর্গত।———দূররে মুখতার ৫পৃঃ

১৫। কারো নিকট কাফ্‌ফারা বা মানত অথবা হজ্জ্ব আদায় করার টাকা আছে, যদি উহা নেসাব পরিমাণ হয়, উহাতে যাকাত ফরয। এগুলো আল্লাহর দেনা এরূপ দেনা যাকাতের প্রতিবন্দক নহে।—(দুররে মুখতার–৬ পৃঃ

১৬। নাবালেগের মালে যাকাত ফরয নহে। তার পক্ষ থেকে তার অলীর উপর মাল হতে উহা আদায় করা জরুরী নহে।
————হেদায়া

১৭। কারবার করার উদ্দেশ্যে অথবা ভাড়া দেয়ার জন্য নির্মিত দালান কোঠা, মিল কারখানা ও সামুদ্রিক জাহাজ প্রভৃতির উপর যাকাত ফরয নয়। বরং উহার নিট আয়ের উপরই যাকাত ফরয। যদি উহা নেসাব পরিমাণ হয় এবং বছর কাল নিজ অধিকারে থাকে।

(১৩৮৫ হিজরীতে কায়রোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ওলামা সম্মেলনের সিদ্বান্ত)

১৮। নাবালেগ সন্তানের বাপ যদি মালদার হয় তাকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। হ্যাঁ ছেলে যদি বালেগ হয় এবং

মালদার না হয়, তাকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। নাবালেগ সন্তানের মা মালদার হলে তাকে যাকাত দেয়া জায়েয। ——————নেজামে যাকাত

১৯। কেহ কোন গরীবের নিকট কিছু পাবে, গরীব উহা আদায় করতে পারছে না। সে যাকাতের নিয়ত করে গরীবকে উহা মাফ করে দিল, উহাতে তার যাকাত আদায় হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে তাকে প্রথমে যাকাত দিয়ে পরে উহা নিজের পাওনা রূপে উসুল করে লওয়াই সমীচিন। ——————দুররে মুখ্তার।

২০। সরকার সরকারী কাজের ব্যয় ভার বহনের জন্য যে ট্যাক্স বা আয়কর উসুল করে উহা দেয়া কালে যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা সরকার উহা যাকাত হিসেবে উসুল করে না এবং শরীয়াত নির্ধারিত খাতে ব্যয়ও করে না।——————কায়রো ওলামা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত।

২১। অনেক লোক আছে যাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, বহু কষ্টে দিন গুজরান করে। অথচ লজ্জায় কারো নিকট কিছু চায় না। এরূপ ব্যক্তিকে তালাশ করে যাকাত এবং অন্যান্য দান খায়রাত দেয়া অধিক সাওয়াবের কাজ।

২২। খুমুছ ও ওশরের জন্য বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। যখনই গণিমাত বা রেকাজ লাভ হবে, তখনই যাকাত রূপে উহার খুমুছ দেবে। যখনই ফসল কাটবে তখনই উহার ওশর আদায় করবে।

মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রঃ) অনূদিত মিশকাত শরীফ (হাদীস গ্রন্থ) এর ৪র্থ জিলদ যাকাত পর্ব হতে পরিশিষ্ট অংশ সংগৃহীত (লিখক)

——সমাপ্ত——